প্রিয়নাথ সিংহ - ৬

দ্বিতীয়বার মার্কিনে যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে, স্বামীজী অনেকটা ভাল আছেন। একদিন প্রাতে তিনি কলিকাতায় কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া বাগবাজারে বলরামবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন নৌকা ডাকিতে গিয়াছে -- স্বামীজী এখনি মঠে যাইবেন। ইতিমধ্যে তাঁহার বন্ধুকে ডাকাইয়া বলিলেন: চল্, মঠে যাবি আমার সঙ্গে -- অনেক কথা আছে।

বন্ধুটি উপবেশন করিলে পর আবার বলিলেন, 'আজ বড় মজা হয়েছে। একজনের বাড়ি গেছলুম, সে একটা ছবি আঁকিয়েছে -- কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রথের উপর, ঘোড়ার লাগাম হাতে আর অর্জুনকে গীতা বলছেন। ছবিটা দেখিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলে, কেমন হয়েছে? আমি বললুম, মন্দ কি! সে জিদ করে বললে, সব দোষ গুণ বিচার করে বল -- কেমন হয়েছে? কাজেই বলতে হল -- কিছুই হয়নি। প্রথমতঃ 'রথটা' আজকালের প্যাগোডা রথ নয়, তারপর কৃষ্ণের ভাব কিছুই হয়নি।'

প্রশ্ন -- কেন প্যাগোডা রথ নয়?

স্বামীজী -- ওরে দেশে যে বুদ্ধদেবের পর থেকে সব খিচুড়ি হয়ে গেছে। প্যাগোডা রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ করত না! রাজপুতানায় আজও রথ আছে, অনেকটা সেই সেকেল রথের মতো। Grecian mytology-র (গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর) ছবিতে যে-সব রথ আঁকা আছে, দেখেছিস? দু-চাকার, পিছন দিয়ে ওঠা-নাবা যায় -- সেই রথ আমাদের ছিল। একটা ছবি আঁকলেই হল? সেই সময়ে সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়েই সেই সময়ের জিনিসগুলো দিলে তবে ছবি দাঁড়ায়। Truth represent (প্রতীকে সত্যকে প্রকাশ) করা চাই, নইলে কিছুই হয় না, যত মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে -- যাদের স্কুলে লেখাপড়া হল না, আমাদের দেশে তারাই যায় painting (চিত্রবিদ্যা) শিখতে। তাদের দ্বারা কি আর কোন ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করানো আর একখানা perfect drama (সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক) লেখা, একই কথা।

প্রশ্ন -- কৃষ্ণকে কিভাবে আঁকা উচিত ওখানে?

স্বামীজী -- শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস? -- সমস্ত গীতাটা personified (মূর্তিমান)! যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুসতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলছেন, তখন তাঁর central idea (মুখ্যভাব)-টি তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।

এই বলিয়া স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে আঁকা কর্তব্য, সেইমত নিজে অবস্থিত হইয়া দেখাইলেন আর বলিলেন:

এমনি করে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা-দুটো হাঁটুগাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে -- ঘোড়াগুলো হাঁ করে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় action (ক্রিয়া) খেলছে। তাঁর সখা ত্রিভুবনবিখ্যাত বীর; দু-পক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতো রথের ওপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই-রকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই অমানুষী প্রেমকরুণামাখা বালকের মতো মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন। এখন গীতার preacher (প্রচারক)-এর এ ছবি দেখে কি বুঝলি?

উত্তর -- ক্রিয়াও চাই আর গাম্ভীর্য-স্থৈর্যও চাই।

স্বামীজী -- অ্যাই! -- সমস্ত শরীরে intense action (তীব্র ক্রিয়াশীলতা), আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত! এই হল গীতার central idea (মুখ্যভাব); দেহ, জীবন আর প্রাণ-মন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।।[১]

-- যিনি কর্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশান্ত রাখতে পারেন, আর বাহ্য কোন কর্ম না করলেও অন্তরে যার আত্মচিন্তারূপ কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তাঁরই সব কর্ম করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে যিনি নৌকা ডাকিতে গিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, নৌকা আসিয়াছে। স্বামীজী যে বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, তাহাকে বলিলেন, 'চল, মঠে যাই। বাড়িতে বলে এসেছিস তো?'

বন্ধু -- আজ্ঞা হাঁ।

সকলে কথা কহিতে কহিতে মঠে যাইবার জন্য নৌকায় উঠিলেন।

স্বামীজী -- এই ভাব সমস্ত লোকের ভেতর ছড়ানো চাই -- কর্ম কর্ম অনন্ত কর্ম -- তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে, আর প্রাণ-মন সেই রাঙা পায়।

বন্ধু -- এ তো কর্মযোগ!

স্বামীজী -- হ্যাঁ, এই কর্মযোগ। কিন্তু সাধনভজন না করলে কর্মযোগও হবে না। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য চাই। নইলে প্রাণ-মন কেমন করে তাঁতে দিয়ে রাখবি?

বন্ধু -- গীতার কর্ম মানে তো লোকে বলে -- বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান, সাধনভজন; আর তা ছাড়া সব কর্ম অকর্ম।

স্বামীজী -- খুব ভাল কথা, ঠিক কথা; কিন্তু সেটাকে আরও বাড়িয়ে নে না। তোর প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, প্রতি চিন্তার জন্য, তোর প্রতি কাজের জন্য দায়ী কে? তুই তো?

বন্ধু -- তা বটে, না-ও বটে। ঠিক বুঝতে পারছিনি। আসল কথা তো দেখছি গীতার ভাব -- 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন' ইত্যাদি। তা আমি তাঁর শক্তিতে চালিত, তবে আর আমার কাজের জন্য আমি তো একেবারেই দায়ী নই।

---

[১] গীতা, ৪।১৮

স্বামীজী -- ওটা বড় উচ্চ অবস্থার কথা। কর্ম করে চিত্ত শুদ্ধ হলে পর যখন দেখতে পাবি -- তিনিই সব করাচ্ছেন, থখন ওটা বলা ঠিক; নইলে সব মুখস্থ -- মিছে।

বন্ধু -- মিছে কেন, যদি একজন ঠিক বিচার করে বোঝে যে, তিনিই সব করাচ্ছেন?

স্বামীজী -- বিচার করে দেখলে পরে তখন। তা সে যখনকার তখনি। তারপর তো নয়। কি জানিস, বেশ বুঝে দেখ -- অহঃরহঃ তুই যা-ই করিস, তুই করছিস মনে করে করছিস কিনা? তিনিই করাচ্ছেন, কতক্ষণ মনে থাকে? তবে ঐ-রকম বিচার করতে করতে এমন একটা অবস্থা আসবে যে, 'আমি'টা চলে যাবে আর তার জায়গায় 'হৃষীকেশ' এসে বসবেন। তযন 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্তিতেন' বলা ঠিক হবে। আর বাবা, 'আমি'টা বুক জুড়ে বসে থাকলে তাঁর আসবার জায়গা কোথায় যে, তিনি আসবেন? তখন হৃষীকেশের অস্তিত্বই নেই!

বন্ধু -- কুকর্মের প্রবৃত্তিটা তিনিই দিচ্ছেন তো?

স্বামীজী -- না রে না; ও-রকম ভাবলে ভগবানকে অপরাধী করা হয়। তিনি সব করাচ্ছেন বলে অসৎ কাজ করলে সর্বনাশ হয়। ঐ থেকেই 'ভাবের ঘরে চুরি' আরম্ভ হয়। ভাল কাজ করলে কেমন একটা elation (উল্লাস) হয়। বুক ফুলে ওঠে। বেশ করেছি বলে নিজেকে বাহবা দিবি। এটা তো আর এড়াবার জো নেই, দিতেই হবে। ভাল কাজটার বেলা আমি, আর মন্দ কাজটার সময় তিনি -- ওটা গীতা-বেদান্তের বদহজম, বড় সর্বনেশে কথা, অমন কথা বলিসনি। বরং তিনি ভালটা করাচ্ছেন আর আমি মন্দটআ করছি -- বল। তাতে ভক্তি আসবে, বিশ্বাস আসবে। তাঁর কৃপা হাতে হাতে দেখতে পাবি। আসল কথা, কেউ তোকে সৃষ্টি করেনি, তুই আপনাকে সৃষ্টি করেছিস কিনা। বিচার এই, বেদান্ত এই। তবে সেটা উপলব্ধি নইলে বোঝা যায় না। সেইজন্য প্রথমটা সাধককে দ্বৈতভাবটা ধরে নিয়ে চলতে হয়; তিনি ভালটা করান, আমি মন্দটা করি -- এটিই হল চিত্তশুদ্ধির সহজ উপায়। তাই বৈষ্ণবদের ভেতর দ্বৈতভাব এত প্রবল। অদ্বৈতভাব গোড়ায় আনা বড় শক্ত, কিন্তু ঐ দ্বৈতভাব থেকে পরে অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি হয়।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন:

দেখ, বিটলেমোটা বড় খারাপ। ভাবের ভরে চুরি যদি না থাকে, অর্থাৎ যদি প্রবৃত্তিটা বড়ই নীচ হয় অথচ যদি সত্যই তার মনে বিশ্বাস হয় যে, এও ভগবান করাচ্ছেন, তাহলে কি আর বেশিদিন তাকে সেই নীচ কাজ করতে হয়? সব ময়লা চট্ করে সাফ হয়ে যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা খুব বুঝত; আর আমার মনে হয় -- বৌদ্ধধর্মের যখন পতন আরম্ভ হল, আর বৌদ্ধদের পীড়নে লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত, বাবা, দু-মাস ধরে আর যাগ করবার জো-টি নেই, একরাত্রেই কাঁচা মাটির মূর্তি গড়ে পূজা শেষ করে তাকে বিসর্জন দিতে হবে, যেন এতটুকু চিহ্ন না থাকে -- সেই সময়টা থেকে তন্ত্রের উৎপত্তি হল। মানুষ একটা concrete (স্থূল) চায়, নইলে প্রাণটা বুঝবে কেন? ঘরে ঘরে ঐ এক রাত্রে যজ্ঞ আরম্ভ হল। কিন্তু প্রবৃত্তি সব sensual (ইন্দ্রিয়গত) হয়ে পড়েছে। ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, 'কেউ কেউ নর্দমা দিয়ে পথ করে'; তেমনি সদ্গুরুরা দেখলেন যে, যাদের প্রবৃত্তি নীচ বলে কোন সৎ কাজের অনুষ্ঠান করতে পারছে না, তাদেরও ধর্মপথে ক্রমশঃ নিয়ে যাওয়া দরকার। তাদের জন্যই ঐ-সব বিটকেল তান্ত্রিক সাধনার সৃষ্টি হয়ে পড়ল।

প্রশ্ন -- মন্দ কাজের অনুষ্ঠান তো সে ভাল বলে করতে লাগল, এতে তার প্রবৃত্তি নীচতা কেমন করে যাবে?

স্বামীজী -- ঐ যে প্রবৃত্তিই মোড় ফিড়িয়ে দিলে -- ভগবান পাবে বলে কাজ করছে।

প্রশ্ন -- সত্য সত্যই কি তা হয়?

স্বামীজী -- সেই একই কথা; উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেই হবে, না হবে কেন?

প্রশ্ন -- 'পঞ্চ-মকার'-সাধনে কিন্তু অনেকের মন যে মদ-মাংসে পড়ে যায়?

স্বামীজী -- তাই পরমহংস-মশাই এসেছিলেন। ও-ভাবে তন্ত্রসাধনের দিন গেছে। তিনিও তন্ত্রসাধন করেছিলেন, কিন্তু ও-রকম ভাবে নয়। মদ খাবার বিধি যেখানে, তিনি একটা কারণের ফোঁটা কাটতেন। তন্ত্রটা বড় slippery ground (পিছল পথ)। এই জন্য বলি, এদেশে তন্ত্রের চর্চা চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আরও উপরে যাওয়া চাই। বেদের [বেদান্তের] চর্চা চাই। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য করে সাধন করা চাই, অখন্ড ব্রহ্মচর্য চাই।

প্রশ্ন -- চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য কি রকম?

স্বামীজী -- জ্ঞান - বিচার বৈরাগ্য, ভক্তি, কর্ম আর সঙ্গে সঙ্গে সাধনা, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি পূজাভাব চাই।

প্রশ্ন -- স্ত্রীলোকের প্রতি এই ভাব কি করে আসে?

স্বামীজী -- ওরাই হল আদ্যাশক্তি। যেদিন আদ্যাশক্তির পূজো আরম্ভ হবে, সেদিন মায়ের কাছে প্রত্যেক লোক আপনাকে আপনি 'নরবলি' দেবে, সেই দিনই ভারতের যথার্থ মঙ্গল শুরু হবে।

এই কথা বলিয়া স্বামীজী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

একদিন তাঁহার কতকগুলি বাল্যবন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন: স্বামীজী, তুমি যে ছেলেবেলায় বে করতে বললে বলতে, 'বে করব না, আমি কি হব দেখবি।' তা যা বলেছিলে, তাই করলে।

স্বামীজী -- হাঁ ভাই, করেছি বটে। তোরা তো দেখেছিস -- খেতে পাইনি, তার উপর খাটুনি। বাপ, কতই না খেটেছি! আজ আমেরিকানরা ভাকবেসে এই দেখ কেমন খাট বিছানা গদি দিয়েছে! দুটো খেতেও পাচ্ছি। কিন্তু ভাই, ভোগ আমার অদৃষ্টে নেই। গদিতে শুলেই রোগ বাড়ে, হাঁপিয়ে মরি। আবার মেজেয় এসে পড়ি, তবে বাঁচি।

রক্ত-মাংসের শরীর, কতই বা সহ্য হবে? এই দারুণ পরিশ্রমের ফলে স্বামীজীর অকালে দেহত্যাগ হয়।